Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেম, বিরহ, বিষাদের স্বরূপ

শুচিস্মিতা পোদ্দার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/19_Suchismita-Poddar.pdf

সারসংক্ষেপ: ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম : ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শামশের আনোয়ার, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দেবদাস আচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার রায়, বেলাল চৌধুরী, অরুণেশ ঘোষ, দেবারতি মিত্র, গীতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ষাটের দশকের কবি সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেম, বিষাদ, বিরহচেতনা প্রবল। ওঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিবিজান ও অন্যান্য কবিতা'প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। কবির জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত দ্বিতীয় তথা অন্তিম কাব্যগ্রন্থ 'বালক জানে না' (ডিসেম্বর ১৯৭৬)। আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে তিনটি পর্ববিভাজনের মাধ্যমে সুব্রত চক্রবর্তীর কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করব। প্রেম, বিষাদ, বিরহভাব কাব্যিক উপাদানরূপে ওঁর কবিতায় কী অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে, আমরা এই সন্দর্ভে সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ: ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শামশের আনোয়ার, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দেবদাস আচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার রায়, বেলাল চৌধুরী, অরুণেশ ঘোষ, দেবারতি মিত্র, গীতা চট্টোপাধ্যায়, প্রেম, বিষাদ, বিরহভাব, কাব্যিক উপাদান

ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম: ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শামশের আনোয়ার, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দেবদাস আচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার রায়, বেলাল চৌধুরী, অরুণেশ ঘোষ, দেবারতি মিত্র, গীতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ষাটের দশকের কবি সুব্রত চক্রবর্তী ১০ অক্টোবর ১৯৪১ সালে অসমের তেজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এস.সি.পাস করেন। তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় মহিষাদল রাজ কলেজে। তারপর বিভিন্ন সময় তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুল, রামপুরহাট কলেজ এবং অবশেষে ১৯৬৬ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বর্ধমান রাজ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করেছেন। ১০ জানুআরি ১৯৮০ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হন। ষাটের দশকের কবি সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেম, বিষাদ, বিরহচেতনা প্রবল। ওঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিবিজান ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। কবির জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত দ্বিতীয় তথা অন্তিম কাব্যগ্রন্থ 'বালক জানে না' (ডিসেম্বর ১৯৭৬)। ভাস্কর চক্রবর্তীর আগ্রহে কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ওঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নীল অপেরা' (জানুআরি ১৯৯০)। আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে প্রেম, বিষাদ, বিরহভাব তিনটি পর্ববিভাজনের মাধ্যমে সুব্রত চক্রবর্তীর কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করব।

কবিতায় প্রেম

সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার কথাই বেশি রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে খুনসুটি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মান-অভিমান তারই কথা রয়েছে অন্যান্য সব কবিতায়। 'বিবিজান' কবিতায় ছিল —

"না হয় খুব চতুর তুমি, মানি;
তোমার হাতে ইস্কাবনের বিবি
এক ঝলকে টেক্কা মহারানী।"

তাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই রাজা, রানী এবং সিপাই এই তিনটি থাকে এর মধ্যে রানীর ভূমিকা তাস খেলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও তিনি বলতে চাইছেন তার রানী ইস্কাবনের তাস খেলার মতোই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিবিই তার মূল চালিকাশক্তি, বিবি অর্থাৎ তার ভালোবাসার মানুষ। তার বিবিজানের হাতের ঝলক, তার হাতের কেরামতি এসব দেখে কবি মোহিত —

"আমায় করে দারুণ সম্মোহন।"

কবিপত্নীর এই নৈপুণ্য কবিকে দারুণ সম্মোহিত করে অর্থাৎ কবির ভালো লাগে তার বিবির এইসব চালচলন, অভিব্যক্তিকে। একটি প্রবচন রয়েছে তুমি যদি ডালে ডালে যাও আমি তাহলে পাতায় পাতায় যাব। এখানেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার খুনসুটি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার মান-অভিমান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ক্ষণিক বিরহ তাকে কবি এইভাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কবি মজার ছলে বলেছেন —

"পাতায় পাতায় তুমি, আমি ডালে।"

অর্থাৎ আমার চেয়েও তুমি চতুর। সাংসারিক কাজকর্মে, সাংসারিক চাতুর্যতায় তুমি আমার থেকে আরো বেশি চতুর —

"আমায় নিয়ে কোথায় যাবে, কোন
আধার হ্রদে, পাই না পানি হালে।"

ভালোবাসার কথা এটি। স্ত্রী তাঁর চোখের সামনে না থাকলে তিনি শূন্য দেখেন তাই তিনি বলেছেন —

"আমায় নিয়ে রঙ্গো মাতোয়ারা
অসাধারণ চাতুরতায় তুমি;"

সেই স্ত্রী যখন তাঁকে সঙ্গো নিয়ে রঙ্গো মাতোয়ারা থাকেন তখন তিনি চোখের সামনে শতযোজন আলোর পথ দেখতে পান —

"আবদ্ধতায় দাও না তুমি সাড়া —
লগ্ন শেষে বাজাও যে ঝুমঝুমি।
অস্বাভাবিক ছটফটিয়ে উঠে
মুখ ফিরিয়ে জানাও, একি পারি!"

তাঁর স্ত্রী যখন নববধূ হয়ে এসেছেন তখন তিনি সাংসারিক কাজে অতটা পটু ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম যখন কোনো কাজ করতেন তখন তাঁর মনে হতো এই কাজটি তিনি করতে পারবেন কিনা। তাঁর মধ্যে সংশয় কাজ করত —

"চিবুক ধরে নগ্ন করপুটে
বিছিয়ে দাও অন্ধকারে শাড়ি।"

এখানে নগ্নতার বর্ণনা আছে, সোহাগের বর্ণনা আছে, ফুলশয্যার সূক্ষ্ম বর্ণনা এখানে পরিলক্ষিত — 'বিছিয়ে দাও অন্ধকারে শাড়ি' লাইনের মধ্যে দিয়ে —

"জোনাকজ্বলা যুথীর কানাকানি —
রাত্রিবাতাস দুলিয়ে গেল শিবির;
আর মনে হয় তোমায় মহারানী —
টেক্কাহাতে ইস্কাবনের বিবি।"

তুমিই মূল চালিকা শক্তি এই পরিবারের, এই সংসারের, এবং তুমিই আমার হৃদয়তন্ত্রী।

'বিবিয়ানা' কবিতাটি কবি স্ত্রী মালা চক্রবর্তীকে নিয়ে রচনা করেছেন। "কি লাজুক আহা ম্রিয়মান দুটি চোখ" এখানে বিবির যে চারিত্রিক হেলদোল বিবির যে চারিত্রিক সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য এখানে বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেছেন —

"রাত বারোটায় স্খলিত আঁচলে এসে
শিয়রে আমার জ্বালাও প্রদীপ দুট

ডাকনাম ধরে কী করুণ ডাকো তুমি —
অন্ধকারেই ভীষণ চেঁচিয়ে উঠি।”

এই ঘটনার উল্লেখ স্ত্রী কবির প্রতি করছেন। যখন অন্ধকার হয় তখন স্ত্রী অন্ধকারকে ভয় পায়। অন্ধকারের অজুহাতে স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে তাঁর স্বামীকে জড়িয়ে ধরেন। এই সূক্ষ্ম রতির খেলা, এই রতি খেলার বর্ণনা কবিতাটির মধ্যে রয়েছে। এই কবিতায় কবি আরো বলেছেন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্যে যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ প্রবেশ করতে চায় বা ভালোবাসার মধ্যে যদি কেউ ব্যাঘাত হতে চায় তাদের প্রতি কবি রুক্ষ। কবি লিখেছিলেন —

“এতদিন তবে পাশাপাশি হাত ধরে —
মুখে নিয়ে বিষ করেছ স্নেহের ভান!
কোন আততায়ী আড়ালে শানায় ছুরি —
মুখোমুখি তুই দাঁড়া দেখি শয়তান।”

‘বিবিজানের উমেদারি’ কবিতায় কবি বলেছেন —

“তোমার স্মৃতি — নদীর স্রোতে ফুল।
হৃদহাওয়ারে নৌকা চলাচল;
অহর্নিশি শূন্য চরাচর —
তুমি আমার যা-কিছু সম্বল।”

কবির স্ত্রী কবির সম্বল। যে ভালোবাসার মানুষ তাঁর সংসারকে গুছিয়ে রাখেন তার মধ্যেই তিনি পান প্রেমিকার ভালোবাসা, তার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান মায়া, তার মধ্যে তিনি আবার বিরহ কাতরতা খুঁজে পান, তিনি খুঁজে পান বিষাদ। তাঁর এই কবিতায় আমরা দেখতে পাই কবি বলছেন —

“বিদায় নিলে শাদা রুমাল নেড়ে —
নিদ্রাহীন রজনী যায়, যায়।”

কবি এখানে সাদা রুমালের ব্যবহার করেছেন। এই ‘সাদা’ রংটি আত্মসমর্পণের প্রতীক। যদি কখনো কবির সঙ্গো কবির স্ত্রীর ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয় তখন কবি মনোমালিন্য মিটিয়ে নিতে বাধ্য হন। কারণ তাঁর বিরহে কবি মুহূর্ত থাকতে পারেন না। কবির তাঁর স্ত্রীর সঙ্গো বিরাগ হয়, তখন ভালোবেসে তিনি উচ্চারণ করেন —

“ক্যাকটাসে ফুটুক ফুল আদিগন্ত স্তবে
ভুরুর বল্লম
ঘনিষ্ঠ আঁধারে কাঁপে। মিথুন-বিপ্লবে
খর পরাক্রম”

অর্থাৎ যদি ক্যাকটাসেও ফুল ফোটে তাহলে তোমার খর মনে ফুল কেন ফুটবে না!

“সহসা ঘনাল মেঘ চতুর বিন্যাসে
নীরালম্ব নীলে:
ঝটিকাবাহিনী নামে তোমার তল্লাসে
বিস্মৃত দলিলে।”

এখানে হঠাৎ করে মেঘ ঘনিয়ে আসার সঙ্গো স্ত্রীর মান-অভিমানের কথা তিনি বর্ণনা করছেন। এবং হঠাৎ বৃষ্টি নেমে আসার সঙ্গো কবি ভালোবাসার প্রস্রবণের কথা বলছেন। তারপরে পুনরায় বলছেন —

“আরোহীহীন নৌকা চলাচল
হৈম পারাবার;
উন্মুখর যাত্রা। দিশাহারা
তাতার মেঘ সহসা হানাদার।”

সংসার নামক সমুদ্রে স্বামী-স্ত্রী তো আরোহী হন। এখানে তিনি তাতার জাতির কথা বলেছেন। এই তাতার জাতি

ভারতকে বারবার লুণ্ঠন করেছে। সেরকমই যেন মেঘ এসে ভালোবাসার মাঝে জায়গা করে নেয়। মেঘ অর্থাৎ বিরাগ মান-অভিমান ইত্যাদি। কিন্তু তার মাঝে বৃষ্টিও নামে;

"পায়ের নীচে ঢেলে দিলাম হিরা-মানিক —
নবাবজাদি, আমার জরিমানা;"

শেষে তাঁর মানভঞ্জা করতে কবিকে তাঁর কাছে যেতে হয়। তাঁকে কিছু উপহার দিতে হয়। তখন তিনি যেন হয়ে যান নবাবজাদি অর্থাৎ নবাবের কন্যা। হীরা মানিক তাঁর চরণে সমর্পণ করে তিনি তাঁর প্রেমিকার মানভঞ্জা করেন —

"এবার তুমি ঝমঝমিয়ে সফর করো
হৃদপ্রাসাদে — শূন্য তো তোষাখানায়।"

কবি চান, তাঁর প্রেমিকা মানভঞ্জন করে তাঁকে জড়িয়ে ধরুক অর্থাৎ এবার ঘনানো মেঘ কেটে যাক, হৃদয়ে বর্ষা নামুক অর্থাৎ হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক —

"সফর শেষে ঢেলে দিলাম চোখের নীচে
নবাবজাদি, আমার প্রতিশোধ,
অন্ধকারে নয়নতারা ফসফরাস —
হৃদনগরে ভাঙছে অবরোধ।"

এই নয়নের যে জল, এই নয়নের জলে সমস্ত মান-অভিমানের অবসান ঘটে যাক, সমস্ত বিবাদের অবসান হোক। সুব্রত চক্রবর্তীর বিবিজানের জন্য আরো কিছু কবিতা রচনা করেছেন। যেমন — 'জ্যোৎস্নায় বিবিজানের ছায়া', 'বিবিজানের মুখশ্রী', 'জ্যোৎস্নায় বিবিজানের তাঁবু', 'বিবিজানের জানালা', 'বিবিজানের ফাঁদ', 'বিবিজানের পাখি', 'বিবিজানের ক্রীতদাস', 'বিবিজানের তাঁবেদারি', 'বিবিজান রায়বাঘিনী', 'বিবিজানের ক্লান্তিবোধ', 'বিবিজানের আলিঙ্গাণ', 'বিবিজানের রাত্রিশেষ' ইত্যাদি কবিতায় কবির বিবিজানের প্রতি যে ভালোবাসা, কবির বিবিজানের প্রতি যে মুগ্ধতা, কবির সঙ্গো বিবিজানের যে মান-অভিমানের সম্পর্ক, যে রাগারাগির সম্পর্ক, এবং রাগের শেষে মান-অভিমানের পর যে ভালোবাসা সে সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সুব্রত চক্রবর্তীর স্ত্রী মালা চক্রবর্তীকে ১২/০৫/২০২৪এ নেওয়া ইন্টারভিউতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম — বিবিজান কে? আপনি কি নিজে? তিনি জানান — বিবিজানকে তিনি বলতে পারবেন না তবে তিনি এইটুকু বলতে পারবেন, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন সেই কবিতায় কবির নিজস্ব কিছু কল্পনা থাকে, কিছু বাস্তব চরিত্র থাকে, সেখানে হয়তো আমি কিছুটা রয়েছি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি পরিমাণ রয়েছে কবির কল্পনা, কবির কাব্যিকতা ফলে সেটাই কবিতায় প্রতিফলিত। আমরা বিবিজানকে নিয়ে বেশিরভাগ কবিতা পড়লেও দেখবো সেখানে শুধুমাত্র বিবিজানের ভালোবাসার কথা তার রাগের কথা তার মান-অভিমানের কথা রয়েছে। বিবিজানকে আলিঙ্গান করা নিয়ে একটি কবিতা রয়েছে। সেখানে তিনি লিখছেন —

"আলিঙ্গানে নিবিড় করো শহরতলি
দুকুলব্যাপী ঊরুর নাচ আর কাঁচুলি—
যাহার নিচে প্রসবসুধা সম্ভাবনা
হাত বাড়িয়ে ডাকে আমায় দুয়ারগুলি!"

— 'বিবিজানের আলিঙ্গান'

প্রসবসুধা এটি সম্ভবত তার স্ত্রী যখন প্রসবসম্ভবা সেই সময় বিবিজানের প্রতি যে ভালোবাসা সে সম্পর্কিত কবিতা এটি। বিবিজান সম্পর্কিত অন্যান্য যে উক্তিগুলি আমরা পাই, সেগুলি নিম্নরূপ —

১. "শুধুই ম্যাজিক, ভেল্কিবাজি —
আর কিছু নেই তোর দুচোখে,
বেকুব হৃদয় কি উন্মুখ —
বলতো ভাসিস কোন আরকে!" (বিবিজানের ম্যাজিক)

২. ‘বিবিজানের মুখশ্রী’ কবিতায় বিবিজানের কণ্ঠের উল্লেখ পাই —

“তোমার মুখ
হৃদয় মাঝে নিরুৎসুক
রহিয়া যায়
জীবনভর
অতর্কিত কলস্বর
উঠল বেজে সন্ধ্যাবেলা”

৩. ‘জ্যোৎস্নায় বিবিজানের তাঁবু’ কবিতায় কবির মধ্যরাতে ঘরে ফেরার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই —

“মধ্যরাতে ঠিকানা ভুল হয়।
হৃদয়ে মুসাবিদা,
চতুর্দশী চাঁদের চতুরালি —
ট্যাক্সিয়ালা, সিধা!”

৪. “টালমাটাল আপাদমস্তক
বুকের নীচে দামাল আভালাঁস;
দিগ্বিদিকে ভূতগ্রস্ত ছুটে
পায়ের নীচে কাঁপিয়ে পরবাস” (বিবিজানের ফাঁদ)

কবিতায় বিরহচেতনা

আধুনিক বাংলা কবিতার কবিদের কাব্যে বিরহচেতনা লক্ষ করা যায়; যেমন — জীবনানন্দ দাশ, শামসের আনোয়ার, ভাস্কর চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দেবারতি মিত্র, তুষার রায়, মণীন্দ্র গুপ্ত, জয় গোস্বামী প্রমুখ। প্রেমের যে প্রাপ্তি সেই অপ্রাপ্তি থেকেই এই বিরহের জন্ম হয়। সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতার মধ্যেও বিরহচেতনা প্রবল পরিমাণে লক্ষণীয়। ‘বালক জানে না’ কাব্যগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘দুই জীবন’। এই কবিতাতে কবি দুই জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন —

“একটা জীবন ভাঙতে-ভাঙতে অন্য জীবন গড়তে থাকি,
এক জীবনের শূন্যতাকে অন্য জীবন ভরিয়ে তোলে,
একটা জীবন জবুথবু, অন্য জীবন হাওয়ায় দোলে —
একটা জীবন যেমন-তেমন, আরেক জীবন সাজিয়ে রাখি।”

এক জীবন থেকে অন্য জীবনে যে যাত্রা, এটি একটি বিরহ জনিত ফলই। অর্থাৎ এক জীবন থেকে অন্য জীবনের যাত্রায় এক ধরনের বিরহ থাকে। পূর্বের জীবনে বিরহ সৃষ্টি হয় বলেই মানুষ অন্য জীবনে চলে যেতে চায় বা অন্য কোনো বিকল্পকে গ্রহণ করতে চায়। বিরহের মধ্যেও যে সুখ থাকে সেটি কবি পরের স্তবকে বর্ণনা করেছেন কবি —

“ফুলের শরীর ছিঁড়তে-ছিঁড়তে পেয়ে গেলাম ফুলের জমক;
ফুলের কঠিন বন্দিশালায় রোদ পড়েছে, পড়ছে ছায়া —
ওই যে রোদে, ওই যে ছায়ায়, দুইটি ফড়িং উড়ছে মায়ায়:
একটা ফড়িং ফুলের কান্তি, অন্য ফড়িং ফুলেরই শোক।
নদীর জলে হাত রেখেছি, নদী আমায় ক্ষমা করে;
নারীর দেহে হাত রেখেছি, নারী আমায় ক্ষমা করে —
জলের স্পর্শে, নারীর স্পর্শে দুইটি জীবন পুণ্যে ভরা:
একটা জীবন নিদ্রাহারা, অন্য জীবন ঘুমের ঘোরে।”

বিরহ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন মানুষ তার ভালোবাসাকে পেয়ে যায়। প্রেমে বিরহ না থাকলে সেই প্রেমে সার্থকতা আসে না। এক সময় সেই বিরহ উত্তীর্ণতার পরেই কিন্তু মিলন হয়। আমরা মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে কেন্দ্র করে যে পদ, সেই পদে রাধা-কৃষ্ণের বিরহ পরিলক্ষিত। এ বিরহ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তবেই কিন্তু রাধা কৃষ্ণকে লাভ করেন। লাভ করেন কৃষ্ণের অনুভূতিকে। সে অনুভূতি তমালের গায়ে দেখেই হোক, বা নীলকণ্ঠ পাখিকে দেখেই হোক, বা আকাশের মেঘ দেখেই হোক। কিন্তু কৃষ্ণের স্পর্শ লাভ করেন তিনি। এই যে প্রেম, এই প্রেমে বিরহ না থাকলে কিন্তু সার্থকতা লাভ হয় না। বিরহে প্রকৃত প্রেমের মূল্যবোধকে বোঝা যায়; তাই বলছেন —

“একটা জীবন এলোমেলো, অন্য জীবন গুছিয়ে রাখি;
এই যে জীবন বহির্মুখী, এই জীবনে ঘরের টান —
ফুলের শান্ত বন্দীশালায় সারা জীবন ভ্রাম্যমান ...
একটা জীবন ভাঙতে-ভাঙতে আরেক জীবন গড়ছি না কি!”

এই বিরহের মাধ্যমে কবির প্রেমের প্রতি যে যাত্রা সে প্রেমকে যখন তিনি লাভ করে ফেলবেন তখন জীবনটা নতুন হবে, অন্যরকম হবে। বিরহে একাকীত্ব বোধ আসে। সুব্রত চক্রবর্তীর ‘মধ্যবয়সের রাত্রি’ কবিতাতে আমরা একাকীত্ব বোধের পরিচয় পাই। “রাত কত! চারিদিকে কম্পমান পাতার মর্মরে / গাছের গভীর দুঃখ সাড়া দেয়।... ” এই যে গাছের গভীর দুঃখ এটা কবিরই দুঃখ।

“... মৃত্যুহীন, জন্মান্তরহীন
একটি ধূসর মথ বসে থাকে নিঃসঙ্গ টেবিলে।
স্বপ্নের নিষ্পন্ন শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে পাশে;
ওর বুকে হাত রাখি,
টের পাই আরতি ও রক্ত চলাচল...
আর দূরে, আলোকিত মাঠ থেকে মৃত শিশু ডাকে, তার
দুটি চোখে পাথরের টান।”

মধ্যবয়সে যে রাত্রির বর্ণনা এই সবকিছুই কবির সঙ্গে রয়েছে ঠিকই, তবুও যেন একাকীত্ব বোধ হয়। এই কবিতার অন্তিমে তিনি লিখছেন — “নিস্পন্দ মথের কাছে আড়াআড়ি দুটি হাত: / রাত কত!” এই যে মথকে ছুঁতে চাওয়া, এই মথকে ছুঁতে চাওয়াই একাকীত্ব ভঙ্গের প্রচেষ্টা —

“চারিদিকে পাতার মর্মরে
গাছের গভীর শান্তি সাড়া দেয়; দূরে
স্মৃতিফলকের কাছে উদাসীন শঙ্খ বাজে,
উড়ে যাই ঠাণ্ডা, শাদা চাঁদ।”

তাঁর যে একাকীত্বের যন্ত্রণা তা অন্য ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়, তাই তিনি সাদা চাঁদে উড়ে যাওয়ার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যন্ত্রণার কথাটি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এই কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা ‘দুঃখিত মানুষ’ এখানে কবি বলেছেন —

“সুখী মানুষের কাছে রাতজাগা দুঃখিত মানুষ
চিঠি লেখে;
পুরনো চিঠির বাক্সে মুখ গুঁজে টের পাই সে
কালির ধোঁয়াটে গন্ধ, অক্ষরের ঠাণ্ডা, কালো জিব —
কবেকার আঙুলের স্পর্শ আর রহস্যের নীচে
কম্পমান দুটি চোখ! দুঃখিত মানুষ — একা —
সারারাত ভেঙেচুরে যায়”

এই যে দুঃখিত মানুষ, একাকীত্ব যুক্ত যে মানুষ, যার বিরহ রয়েছে, যে বিরহ চেতনাকে প্রবলভাবে অনুভব করে নিজের শরীরে, সেই রকম এক রাত জাগা দুঃখি মানুষের কথা এই কবিতাতে রয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'আসে' কবিতায় আমরা পাই —

"শীতের বাতাস আজ ঘুরে যায় কক্ষে-কক্ষান্তরে, সারারাত।
স্মৃতি-বিস্মৃতির কাছে একা-একা জেগে আছি —"

ভাস্কর চক্রবর্তী শীতকে জড়িয়ে ধরতে ভালোবাসতেন। কিন্তু এই শীত যেন এই কবিকে জড়তাগ্রস্ত করে তোলে। কবির জড়চেতনাকে জাগ্রত করে। কবির বিষণ্ণতাকে, বিরহ চেতনাকে যা জাগ্রত করে সেজন্য স্মৃতি-বিস্মৃতির উল্লেখ রয়েছে;

"বেজে ওঠে বিশাল পিয়ানো...
কবেকার প্রিয় সুর শোনা যায়।
চঞ্চল আঙ্গুলগুলি খেলে শাদা রিডে;
কেবল আঙুল দেখি
যেন স্বপ্নে
মায়াবী আলোয় যেন —"

মানুষের মধ্যে বিরহ চেতনা প্রবল হলে মানুষ তখন কোনো কিছুকে আঁকড়ে রাখতে ভালোবাসে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে যেমন রয়েছে কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার মনে প্রেমসঞ্চার, কৃষ্ণানুরাগ সঞ্চার হয় এটাও যেন এক ধরনের বিরহ। কৃষ্ণানুরাগের পরেই রাধার মনে বিরহ সৃষ্টি হয়েছিল। সে রকম কবি এখানে সুরের মাধ্যমে বিরহকে কাটাতে চাইছেন। মধ্যযুগের কবিতায় আমরা দেখেছি যে রাধা বিরহে আহত হচ্ছেন সুরের মাধ্যমে। কবি এখানে বিরহ থেকে সুরের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হতে চাইছেন। এই কাব্যগ্রন্থে 'বিবিজান' নামে একটি কবিতা রয়েছে যেখানে বিবিজানকে তিনি ধাতুর মূর্তি বলেছেন। অভিমানের মধ্যে বিরহের নিদর্শন এই কবিতাটিকে ব্যক্ত হতে লক্ষ করা যায় —

"কপালে সিন্দুর-টিপ — বসে আছ। সমুদ্র-বাতাসে
ধাতুর মূর্তির মতো; বিবিজান, তোমার নূপুর
অনিকেত নোনাজলে ডুবে আছে।... "

'প্রতীক্ষা' কবিতায় কবি লিখেছেন —

"গ্রীষ্মের বিকেল দীর্ঘ, পাথরের নীচে
রেখেছি তোমার চটি; স্মৃতির ভেতরে দেখি তুমি, প্রিয়, শীতের বাগানে
উজ্জ্বল চপ্পল রেখে চলে গেছ!... ফিরে আসতে পার,
এই ভেবে যায় ঋতু।... "

এটি চূড়ান্ত বিরহচেতনার কবিতা। এই 'প্রতীক্ষা' নামে বোঝা যাচ্ছে তিনি অপেক্ষমান বা প্রতীক্ষমান কোন সে নারীর জন্য।

কবিতায় বিষাদের স্বরূপ

বিষাদ সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য প্যাশন। কান্না, শোক, নৈঃশব্দ্য, অন্ধকার, ভঙ্গুরতা, নিঃসঙ্গাতা, হতাশা, ক্ষোভ, অপ্রেম ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে ওঁর কবিতার স্তবকে স্তবকে। ভয় ও ভালোবাসার প্রশ্রয়ের যে দ্বন্দ্ব তা ফুটে উঠেছে ওঁর কবিতায়। ভয় উত্তীর্ণ হওয়া যায় মানুষের ভালোবাসা পেলে। 'প্রভু, দয়া করো' কবিতায় এক সন্দেহের প্রতিফলন দেখা যায়, যা যুবা বয়সের ধর্ম —

"সারাদিন শুধু সন্দেহে থরোথরো
রাত্রে আমার ভয়;
তোর দিকে মুখ তুলবার প্রশ্রয়
হারিয়ে ফেলেছি কবে!

হৃদয় আমার দাপট মহোৎসবে
মদের কেয়ারি — করোটি ভরাট করো।"

ধরতে গেলে এটি কবির চাকরি পাওয়ার আগের কবিতা। তাই কবির মাথায় ভিড় করে থাকা নানা চিন্তা যেমন কবির জীবন কীভাবে এগোবে, কবি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কিনা, মানুষ কী ভালোবাসবে, সে কী কবিতা লিখতে পারবে, মানুষের ভালোবাসা পাবেন? এ সন্দেহ অপরেরও হতে পারে আবার কবির নিজেরও হতে পারে। কবির জীবনটা সুগঠিত নয়, সংগঠিত নয়, তার জীবনের নানা দ্বিধা রয়েছে, নানা দ্বন্দ্ব রয়েছে, রয়েছে উথ্থান-পতন। তাঁর ভালোবাসার মানুষ তাঁকে কাছে আসতে দেবেন কিনা, প্রশ্রয় পাবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। জীবন পুষ্পের মতন নয় আমরা জানি। হতাশাগ্রস্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে যুবসমাজ ডুবে থাকে মোহে। কবি তুষার রায়ের কবিতাতেও আমরা দেখতে পাবো ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় একত্রে মদ্যপান করছেন। নেশাগ্রস্ত হওয়ার মানে জগৎটাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করা। মানুষের মনের যে ভার তা হালকা হয়ে যায় আর এটাই তাদের কাছে মহোৎসব —

"উড়িয়ে দিলাম ফুৎকারে প্রিয়তম
তোর সে মুখচ্ছবি —
সারাদিন তাই সন্দেহে থরোথরো"

কবি তাঁর প্রিয় মানুষকে তাঁর কাছে আসতে দিতে চাইছেন না, তাঁর ছবি উড়িয়ে দিচ্ছেন কিন্তু কবি আসলেই কী তা পারছেন? সারাদিন তাই কবির মনের দ্বন্দ্ব তাকে নিজের কাছে আসতে দেবে না ভেবে দূরে সরিয়ে রাখেন —

"কোথায় যে পৌঁছবি
আমাকেও নিয়ে
সারারাত তাই ভয়
আরও একবার মেনে নিয়ে পরাজয়
ত্রিশিরা কাচের চিত্র
করিস জড়ো;
আর দিনরাত
তোর চোখে প্রশ্রয়।"

কবি অন্যকে দোষারোপ করছেন না, সমস্ত দোষ, গুণ, বলয় সবকিছু নিজের মধ্যেই আত্মস্থ করতে চান, যা কবির ধর্ম। কবি সুব্রত চক্রবর্তী প্রেমের অপূর্ণতাকে তাঁর 'আমার বুকে অন্ধকার' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। নিজের ভালোবাসার মানুষকে কাছে না পাওয়ার যে যন্ত্রণা তা ফুটে উঠেছে কবিতায়। রক্তমাংসের কবির বুকে যে প্রেম ভালোবাসা আছে সেই প্রেম কবির প্রিয়তমা না বুঝে অন্য কোথাও সেই প্রেমের অন্বেষণ করে চলেছেন তাই কবি আফসোস করে বলেছেন —

"আমার বুকে অন্ধকারে গোলাপ ফোটে
তুমি তা টের পেলে না
রাতবিরেতে কার বাগানে শূন্যসাজি
অন্বেষণ
এই বাগানে ভুলবশত আর এলে না"

এই প্রেমের অপূর্ণতা থেকে কবি অন্য কোথাও সেই প্রেম খুঁজতে চান, কিন্তু সেই প্রেম কবির মনকে সিক্ত করতে পারে না —

"নদীর স্রোতে ভেসে গেলাম অন্যদেশে
তুমি কি হদিস জানো

ভুল নদীতে অবগাহন ভরদুপুরে
শরীর ভেজে শুকিয়ে যায়
মন ভেজে না”

কবি আরো জানিয়েছেন চারিদিকে প্রেম ভালোবাসা রয়েছে কিন্তু কবির বুকে জমে আছে না পাওয়ার বেদনা যা থেকে কবির মন কবির থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছে। তাই কবির ভাষায় —

“একলক্ষ গোলাপ ফোটে অন্ধকারে
আমার বুকে সকাল হলে শূন্যতার
অন্ধকার আমার বুকে এখন এসে
দাবি জানাও
দেব তোমায় কি উপহার
টালমাটাল স্রোতের টানে ভেসে গেলাম
অন্যদেশে”

‘শ্মশানে রক্ষিতা’ কবিতায় কবি লিখেছেন —

“চিতার আলোয় বসে আমার রক্ষিতা
চিঠি পড়ে-সেঁকে নেয় শাদা নুলোহাত;
গ্রীবার পশ্চিম-দিকে এত অন্ধকার!
কোথায় করাত”

কবি ভাবছেন কবির যখন মৃত্যু হবে, কবির ভালোবাসার মানুষ যাকে তিনি এতদিন ভালোবাসার বেড়া দিয়ে রক্ষা করতেন সেই রক্ষিতার কী হবে। এই রক্ষিতা তথাকথিত সেই রক্ষিতা নয় এ কবির ভালোবাসার মানুষ যাকে কবি ভালোবাসা দিয়ে রক্ষা করেন। কবি চলে যাওয়ার পর কবির ভালোবাসার মানুষটির অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী বা প্রেমিকার কী হবে সেই অবস্থানের কবিতা এটি। এখানে ‘চিঠি পড়ে’ শব্দটির মধ্যে বোঝা যাচ্ছে এ কবির স্ত্রী অথবা কবির প্রেমিকা যে কবির মৃত্যুর পর কবির চিতার পাশে বসে কবির চিঠিগুলি পড়ে স্মৃতি রোমন্থন করবেন —

“চালাবার শব্দ হয়, নাকি তাঁতকল!
শীতার্ত শিশুর কণ্ঠে ‘প্রভু, দয়া করো!’ ”

কবির মৃত্যুর পর কবির সন্তানের কী হবে এ চিন্তা তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করেছে। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন —

“আমিও প্রেতের মতো দগ্ধ হাত তুলে
বলি, ‘চিঠি পড়ো —’ ”

কবির মৃত্যুর পর কবির স্ত্রীর বুকে যে শূন্যতা জন্মাবে সেই শূন্যতা কবি দূর করতে বলেছেন চিঠি পড়ে —

“খুঁজে দেখো পাও নাকি পাখির সান্ত্বনা”

পাখির চঞ্চলতার বিপরীতে যে মানসিক স্থিরতা রয়েছে কবির মৃত্যুর পর কবির সন্তান বা তাঁর স্ত্রী সে চিঠিগুলি পড়ে সেই মানসিক স্থিরতা পায় কিনা তার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে —

“নিভন্ত আলোয় বসে রক্ষিতা আমার
খুলে ফেলে অঙ্গুরীয়

“ ‘সহমৃতা হও
ভাঙো কারাগার’ ”

কবি চান কবির মৃত্যুর পর কবির স্ত্রী বা কবির প্রেমিকা সহগামী হন। কারণ কবি-চাননা কবির মৃত্যুর পর তিনি যখন থাকবেন না কবির সন্তান, কবির স্ত্রী বা তাঁর প্রেমিকার জীবন; তাঁর সেই তথাকথিত রক্ষিতার জীবনটা বিভীষিকাময় হয় অথবা হোক, যাদের আজীবন তিনি ভালোবেসে চলেছেন।

কবি অনেক কবিতার অন্তিম পংক্তিতে ব্যবহার করেছেন রূপক অলংকার। তিনি রাক্ষসীরূপ সময়ের

প্রভাব বিষয়ে কবিতায় জানিয়েছেন। কবি কবিতায় উৎপ্রেক্ষা, উপমা, সমাসোক্তি, অনুপ্রাস অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগের সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কবির কবিতায় মাঝে মধ্যেই অলংকারের ঝলক চোখে পড়লেও কবির বরাবরের আগ্রহ ছিল গয়নাহীন কবিতা রচনার প্রতি। সুব্রতর কবিতায় জীবন ও রাস্তার প্রতীকরূপে বারেবারেই ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দগুলি — যা ঘুরে, ফিরে গলি, বালি, ধূ ধূ রাস্তা, মরুভূমি, উট। গদ্যে চিরকাল সুব্রত চক্রবর্তী কবিতা লেখেননি। তবে ছন্দ বিষয়ে বেশি ভেবেছেন যে কবিতায়, সে কবিতা কবিতা হয়ে ওঠেনি। 'শিলাদিত্য' পত্রিকার পয়লা জুলাই ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নের উত্তরে দেবারতি মিত্র কবিতায় ছন্দ ব্যবহার বিষয়ে জানিয়েছিলেন — "আমার কবিতায় ছন্দ নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। কারণ ওই ব্যাপারে আমি আলাদা করে কিছু ভাবিনি, কখনো তেমন নজরও দিইনি। আলো-বাতাস, ধুলোবালির মতো তারা আমার কবিতায় খেলা করেছে — আমি সরাবারও চেষ্টা করিনি, বিশিষ্ট কোনো আদলও দিইনি।" কবিতায় ছন্দের সরল খেলায় বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা কবি আজীবন করেননি। সরল কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে কবি ছিলেন আগ্রহী।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অভীক মজুমদার, 'বাস্তবতার মায়া', ঋক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২২

২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬

৩. প্রশান্ত মাজী, 'আমার মন ছুটেছে বর্ধমান', ঋক প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭

৪. প্রশান্ত মাজী, 'শুনো না তত্ত্বের কথা', ভালো বই, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৩

৫. সুবল সামন্ত সম্পাদিত, 'বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা: প্রথম খণ্ড', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৫

৬. সুব্রত চক্রবর্তী, 'কবিতাসংগ্রহ', পরম্পরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগস্ট ২০১৫

৭. সুব্রত চক্রবর্তী, 'প্রিয় ভাস্কর', ভালো বই, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৪

লেখক পরিচিতি: শুচিস্মিতা পোদ্দার, স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী।